ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা ॥ সংখ্যা ১০৪ ও ১০৫ (যুক্ত), সেপ্টেম্বর ২০২৪
ISSN: 2411-9059, e-ISSN: 3006-3078 DOI: http://dx.doi.org/10.62296/DVP/10405/001

সাংস্কৃতিক উপনিবেশায়ন ও রামমোহন রায়ের দর্শনচিন্তা

রায়হান রাইন*

Abstract: In Bangla region the process of European cultural colonisation commenced in connection with the British colonial rule. Raja Ram Mohun Roy believed that for the native people the practice of European arts and science will prepare them for their political as well as civil rights. For this reason he became an upholder of this process of cultural colonisation. At that time he tried to establish a monotheistic universal religion. The basis of this religion was philosophical monism. The aim of this essay is to investigate the nature and impact of cultural colonisation on his philosophical thought. In *Tuhfat-ul Muwahhidin*, we observe Ram Mohun as a consistent rationalist, but later, in the course of cultural colonisation, he changed his position. Under the influence of British utilitarianism he began to accept the social utility of the authority of *Vedas*. Besides as he was overwhelmed with the modernist concept of homogeneity, he rejected the variety of monotheistic practices of Bengali local culture.

মুখ্যশব্দ: সাংস্কৃতিক উপনিবেশায়ন, বিমূর্ত অদ্বৈতবাদ, ব্রহ্মোপাসনা, উপযোগবাদ, আধুনিকতা

* অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

রাজা রামমোহন রায় ইউরোপীয়দের সংস্পর্শে আসেন কুড়ি বছর বয়সে। সেই সময়ের আগে তিনি ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের ব্যাপারে ক্ষুব্ধ ছিলেন। তবে এই মনোভাবের পরিবর্তন ঘটে ইউরোপীয়দের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ যোগাযোগ এবং তাদের আইন-কানুন ও শাসন ব্যবস্থার সঙ্গে পরিচয়ের ভেতর দিয়ে। *অ্যাথেনিয়াম* ও *লিটারারি গেজেট*-এ প্রকাশিত আত্মজীবনীমূলক একটি চিঠিতে রামমোহন লেখেন, ইউরোপীয়দের ব্যবহার এবং ভদ্র ও দৃঢ় আচরণ দেখে তাদের প্রতি তাঁর পূর্বসংস্কার দূর হয় এবং তাদের প্রতি তিনি অনুরক্ত হয়ে পড়েন। তাঁর মনে হয়, বিদেশি শাসন হওয়া সত্ত্বেও ব্রিটিশদের আইন স্থানীয় অধিবাসীদের দ্রুত উন্নয়ন ঘটাবে।

রামমোহন অচিরেই ইউরোপীয়দের উপনিবেশ ও বিদেশি শাসনের সহযোগী হয়ে ওঠেন এবং তাঁর মনে এই ভাবনা জোরালো হয়ে ওঠে যে ইউরোপীয় জ্ঞান, কলা ও বিজ্ঞানচর্চা এদেশীয়দের 'চরিত্রের উন্নতি' ঘটাবে। এ কারণে তিনি চাইতেন, ভারতবর্ষে ইংরেজরা স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হোক, ভারতীয়রা তাদের রক্ত, স্বপ্ন ও চিন্তার উত্তরাধিকারী হোক।

ইউরোপীয় উপনিবেশের সহযোগী ভাবাদর্শগুলো ছাড়া ভারতীয় সভ্যতার মহত্তম সবকিছু থেকেই একপ্রকার বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন রামমোহন। তিনি শাসন পরিচালনা, বাণিজ্য নীতি এবং ভারতে ইউরোপীয়দের বসতি স্থাপন সংক্রান্ত যেসব যুক্তি ও দাবি উত্থাপন করেন তার উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয়দের জন্য ইংরেজ শাসনকে সহনীয় ও উপযোগী করে তোলা। তিনি শিক্ষা সংস্কার এবং ধর্ম সংস্কার নিয়ে যে আন্দোলন করেন তার পেছনেও ছিল ঔপনিবেশিক শাসনের উপযোগী একটি ভারতীয় সমাজ প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা। তবে রামমোহন চাইতেন, সেই সমাজের মানুষ হবে এমনই যারা তাদের নাগরিক ও রাজনৈতিক সুবিধাগুলো আদায় করে নিতে পারবে। আমরা দেখতে পাই, রামমোহন যে সর্বজনীন ধর্ম প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন তার ভিত্তিমূলে থাকা দার্শনিক ভাবনার নির্মাণে জোর প্রভাব ফেলছে ইউরোপীয়দের সাংস্কৃতিক উপনিবেশায়ন।

১. সাংস্কৃতিক উপনিবেশায়ন ও এর প্রেক্ষাপট

একটা দেশ বা ভূখণ্ডে বিজাতীয় সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের প্রেক্ষাপট তৈরি করে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উপনিবেশ। বাংলা অঞ্চলে তেমনটাই ঘটেছে। আমরা দেখতে পাই, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দেওয়ানি ক্ষমতা লাভের পর তাদের মনোযোগের কেন্দ্রে ছিল রাজস্ব আদায়। শুরুতে ফৌজদারি কাজের ভার আগের মতোই ছিল মুর্শিদাবাদের মুসলমান শাসকদের হাতে এবং আইন-আদালত চলতো পুরনো রীতিতে। এর কারণ ইংরেজদের হাতে তখনও শাসন

পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় আমলাতন্ত্র, ফৌজ ইত্যাদি ছিল না এবং শাসক হিসেবে তাদের ভূমিকা কী হবে সে সম্পর্কেও স্পষ্ট কোনো ধারণা ছিল না, কিন্তু চেতনায় বণিকবৃত্তি ছিল শতভাগ। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময়েও রাজস্ব আদায় চলেছে পুরোদমে। দুর্ভিক্ষে দেশের এক-তৃতীয়াংশ মানুষের জীবনহানি ঘটলেও কোম্পানির রাজস্বের পরিমাণে ঘাটতি হয়নি। ইংল্যান্ডের কর্তৃপক্ষকে লেখা ওরায়েন হেস্টিংসের পত্র থেকে জানা যায়, দুর্ভিক্ষে মৃত্যুর কারণে রাজস্বের যে ক্ষতি হয়েছে তা জোর করে আদায় করা হয়েছে বাকি দুই-তৃতীয়াংশ মানুষের কাছ থেকে (শিবনাথ, ১৯০৯, পৃ. ৯২) ওই পত্রে হেস্টিংস লেখেন, অধীন কর্মচারীদের ওপরে নির্দেশ ছিল, রাজস্বের এক কানাকড়িও যেন ছাড় দেওয়া না হয়।

দেওয়ানির পুরো সময় জুড়ে ইংরেজদের শাসন ছিল হালছাড়া। তাদের মধ্যে শাসকের কর্তব্যবোধের লেশমাত্র ছিল না। শাসিত জনগণের মধ্যেও বিশ্বাস ছিল না শাসকের প্রতি। ফলে সৃষ্টি হয়েছে রাজনৈতিক অস্থিরতা। মুসলমান নবাবদের সঙ্গে সৃষ্টি হয়েছে কলহ-বিবাদ। বিরোধ সৃষ্টি হয়েছে দাক্ষিণাত্যে মারাঠিদের সঙ্গে এবং পূর্বে মগ জনগোষ্ঠীর সঙ্গে। বিদ্রোহ হয়েছে বিষ্ণুপুর, বীরভূমসহ নানা জায়গায়। তবে উনিশ শতকের গোড়ার দিকে অবস্থাটা বদলাতে শুরু করে। এসময় শাসক ও শাসিতের সম্পর্কের ভেতর একটা রূপান্তর শুরু হয়। এর কারণ ছিল উভয়ের মধ্যেই তখন এমন একটা বিশ্বাস প্রবল হতে শুরু করে যে ইংরেজ শাসন এদেশে স্থায়ী হতে যাচ্ছে। এ সময় থেকে স্থানীয়দের মধ্যে ইংরেজি শেখার আগ্রহ প্রবল হয়। শাসক গোষ্ঠীও তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উপনিবেশকে ক্রমশ সাংস্কৃতিক উপনিবেশে রূপান্তরিত করতে শুরু করে।

সাংস্কৃতিক উপনিবেশায়ন এমন এক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে উপনিবেশিত জনগোষ্ঠী সাংস্কৃতিকভাবে পরাধীন হয়ে পড়ে এবং এই পরাধীনতা ওই জনগোষ্ঠীর চূড়ান্ত পরাজয় নির্দেশ করে। এটা কেবল বিদেশি সংস্কৃতির আত্তীকরণ নয়, বরং এমন এক সাংস্কৃতিক আনুগত্য, যেখানে কোনো তুলনামূলক বিচার ছাড়াই বিজাতীয় সংস্কৃতির অধীনে ঐতিহ্যগত ভাবধারা ও অনুভূতিগুলো চাপা পড়ে যায় (কৃষ্ণচন্দ্র, ১৯৯২: পৃ. ৯)। এদেশে ইউরোপীয় সাংস্কৃতিক উপনিবেশায়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হতে থাকে শিক্ষা সংস্কার, বিদ্যালয় স্থাপনের মাধ্যমে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য এবং ইউরোপীয় বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া, ইউরোপীয়দের বসতি স্থাপন, শাসন পরিচালনায় এদেশীয় ইংরেজি শিক্ষিত জনগোষ্ঠীকে যুক্ত করা, খ্রিষ্টধর্ম প্রচার ইত্যাদি নানা উপায়ে।

এসময় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপন করা হয়। উদ্দেশ্য ছিল দক্ষ আমলাতন্ত্র সৃষ্টির জন্য সিভিলিয়ানদের এদেশীয় ভাষা শেখানো। অন্যদিকে এদেশীয়দের মধ্যে ইংরেজি শেখার আগ্রহ বাড়ে সরকারি ও সদাগরি চাকরি পাওয়ার আশায়। এছাড়া চিরস্থায়ী বন্দোবস্তও শিক্ষিত বাঙালির উন্নতি করার সোপান হয়ে ওঠে। ইংরেজি ভাষা, সাহিত্য ও বিজ্ঞান শেখানোর জন্য প্রতিষ্ঠিত হয় হিন্দু কলেজ। এছাড়াও ফিরিঙ্গিদের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় বেশকিছু ইংরেজি বিদ্যালয়।

উপানিবেশায়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয় এদেশে ইউরোপীয়দের বসতি স্থাপনের ভেতর দিয়ে। ১৮১৩ সালে কোম্পানির নতুন সনদে ভারতবর্ষে কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্য সুবিধা লুপ্ত হয়। এই সুবিধা তারা এককভাবে নিজেদের অধিকারে রেখেছিল দেওয়ানি ক্ষমতা পাওয়ার পর থেকে। নতুন সনদের পর কোম্পানির বাইরে ব্রিটিশ বণিকদের ব্যক্তিগত বাণিজ্যের সূত্রপাত ঘটে। ১৮২৪ সাল থেকে অন্য ইউরোপীয়দেরকেও দেওয়া হয় এই অধিকার। তারা এদেশে জমি কিনে স্থায়ীভাবে বসবাসের সুযোগ পায়। ইউরোপীয়দেরকে এই অধিকার দেওয়ার ক্ষেত্রে গভর্নর জেনারেল বেন্টিংক যেসব যুক্তি দেখিয়েছিলেন, তাতে এই দূরদর্শী ভাবনা ছিল যে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বেশিসংখ্যক ইউরোপীয়দের অবস্থান সরকারকে শক্তিশালী করবে এবং এদেশীয় জনগণ ইউরোপীয়দের কাছ থেকে তাদের অভ্যাস, ভাষা, জ্ঞান ও ধর্ম অর্জন করবে। এভাবে যারা ইউরোপীয় ভাবধারা গ্রহণ করবে তারা পুলিশে নিয়োগ দেওয়ার উপযুক্ত উৎস হবে (দেবোত্তম, ২০২২, পৃ. ৩৬৫-৬৬)। চার্লস মেটকাফ কোম্পানির পরিচালকবৃন্দকে বেন্টিঙ্কের সিদ্ধান্তের রাজনৈতিক তাৎপর্য সম্পর্কে বলেন, 'আমি আরও নিশ্চিত যে, যদি আমরা ভারতীয় জনসাধারণের একটি প্রভাবশালী অংশকে অভিন্ন স্বার্থ এবং সহানুভূতির দ্বারা আমাদের সরকারের সঙ্গে সংযুক্ত করে সাম্রাজ্যের শিকড় বিস্তার করতে না পারি, তবে আমাদের ভারত-সাম্রাজ্য সব সময়েই বিপজ্জনক অবস্থায় থাকবে' (দেবোত্তম, ২০২২, পৃ. ২২৬)। মেটকাফের এই পর্যবেক্ষণ ইউরোপীয়দের সাংস্কৃতিক উপনিবেশায়নের দূরদর্শী ভাবনাকে স্পষ্ট করে তোলে।

দেওয়ানির বছরগুলোর তিক্ত অভিজ্ঞতার কারণে ইংরেজ শাসকেরা যেকোনো ধরনের সংস্কারের ক্ষেত্রেই সতর্ক ছিল। এদেশে মিশনারিদেরকে তারা খ্রিষ্টধর্ম প্রচারের অধিকার দেয়নি। কলকাতার উত্তরে শ্রীরামপুরে যে মিশনারিরা বাস করতেন, উইলিয়াম কেরী, মার্শম্যান এবং ওয়ার্ড, তাঁরা ধর্ম প্রচারের অনুমতিপত্র নিয়েছিলেন ডেনিশ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে (শিবনাথ, ১৯০৯, পৃ. ৭২)। তাঁরাই এদেশীয়দেরকে প্রথম খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত করা শুরু করেন। ধর্মান্তরিত খ্রিস্টানদেরকে ইংরেজি শেখানোর মাধ্যমে ইউরোপীকৃত করার চেষ্টা করা

হয় (শিশিরকুমার, ১৯৯৯ পৃ. ৭৬)। এদেশীয়রা ওই সময়ে খ্রিষ্টধর্মকে ইউরোপীয়দের ধর্ম বলেই ভাবত। শ্রীরামপুর মিশনারিরা খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিতদেরকে ইংরেজি শেখানোর কথা ভাবেন। ১৮১৫ সালে তারা প্রতিষ্ঠা করেন একটি ইংরেজি কলেজ। পাশাপাশি বাইবেলের বাংলা অনুবাদের জন্য তারা বাংলা ভাষার সংস্কারও শুরু করেন।

এদেশের শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে ক্রমশ পাশ্চাত্য প্রভাব জোরালো হতে থাকে। তাদের মধ্যে পশ্চিমা যুক্তিবাদ ও আধুনিকতার যে বোধ সৃষ্টি হয় সেটা দিয়েই তারা সামাজিক ও নৈতিক মূল্য বিচার শুরু করে এবং ভারতীয় সভ্যতার অতীত উপাদানগুলোর সঙ্গে ক্রমশ বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হতে থাকে। একই সঙ্গে শুরু হয় পশ্চিমা সভ্যতার প্রতি নির্বিচার পক্ষপাত। তবে সেই আধুনিকতা বুর্জোয়া আধুনিকতা নয়, সেটা ছিল পশ্চিমা আধুনিকতার এক পঙ্গু ও দুর্বল অনুকরণ মাত্র (সুমিত, ২০০০, পৃ. ২৩)। এই আধুনিকমনস্করা ভারতীয় সংস্কৃতির উৎকৃষ্ট উপাদানগুলোকে আবিষ্কারের চেষ্টা করেনি। তারা কোনো তুলনামূলক বিশ্লেষণ ছাড়াই পশ্চিমা ভাবাদর্শের প্রতি আনুগত্য ও বশ্যতা দেখিয়েছে।

ইংরেজরা যে মুষ্টিমেয় সংখ্যক ভারতীয়কে তাদের শাসন প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত করে রামমোহন ছিলেন তাদের একজন। এই অল্পসংখ্যক ভারতীয়কেই তারা সরকারিভাবে 'ইন্ডিয়ান পাবলিক' বলে অভিহিত করত এবং তাদের মতামতকেই শাসন সংক্রান্ত ব্যাপারে ভারতীয় জনমত বলে চালিয়ে দিত (রণজিৎ, ২০১০, পৃ. ১১৫)। রামমোহন ইংরেজদের বাণিজ্য, বসতি স্থাপন এবং বিচার ও শাসন সংক্রান্ত ব্যাপারে তাঁর যুক্তি ও পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি ইংল্যান্ড গিয়েছিলেন পার্লামেন্ট ভবনে নিজে উপস্থিত থেকে শাসন সংক্রান্ত তাঁর অভিপ্রায় ও পরামর্শ দেওয়ার জন্য। সে-সময়ে তিনি রাজস্ব ও বিচার-ব্যবস্থা সম্পর্কে বেশকিছু নিবন্ধ লিখে নিয়ন্ত্রণ বোর্ডে পাঠান, পরে সেইসব লেখা পাঠানো হয় হাউজ অব কমন্সে। ওই সময় বিচার ও শাসন সংক্রান্ত যেসব যুক্তি ও পরামর্শ তিনি দেন তার বিষয় ছিল ভারতীয় শাসন প্রণালীর সংশোধন, সতীদাহ প্রথার বিলোপ, এদেশীয়দের উচ্চপদে চাকরি দেওয়া ইত্যাদি। রামমোহনের এসব পরামর্শ ও চেষ্টার কিছু সফলতা আমরা দেখতে পাই। কোম্পানির নতুন সনদ প্রবর্তনের পর এদেশীয় ইংরেজি শিক্ষিতরা ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হওয়ার সুযোগ পেতেন।

রামমোহনের সংস্কার আন্দোলনগুলোর উদ্দেশ্য ছিল কোম্পানির শাসনকে ভারতীয়দের জন্য উপযোগী করে তোলা, অর্থাৎ এই শাসন ব্যবস্থাকে এমন একটা স্থিতাবস্থায় রাখা যাতে শাসক-শাসিতের সম্পর্কের ভেতর গুরুতর ফাটল না ধরে। তাঁর প্রধান চাওয়া ছিল এটাই যে,

ইউরোপীয় সভ্যতার সান্নিধ্যে থেকে তাদের বিজ্ঞান, কলা ও সামাজিক জ্ঞানের আলোয় ভারতীয়রা আলোকিত হবে। তিনি তাঁর বন্ধু ক্রফোর্ডকে এক ব্যক্তিগত পত্রে লেখেন, 'ধরুন প্রায় ১০০ বছর ধরে ইউরোপীয়দের সঙ্গে ক্রমাগত মিলন এবং সাধারণ ও রাজনৈতিক জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি আধুনিক কলা ও বিজ্ঞান চর্চার ফলে যদি স্থানীয়দের চরিত্র উন্নত হয়, তাহলে এটা কি সম্ভব যে সমাজের মাপকাঠিতে তাদের হেয় করার জন্য কোনো অন্যায় ও নিপীড়নমূলক পদক্ষেপকে কার্যকরভাবে প্রতিরোধ করার চেতনা ও প্রবণতা তাদের থাকবে না?' (দেবোত্তম, ২০২২, পৃ. ৩৬৭) সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ আইনের বিরুদ্ধে রামমোহন 'আপিল টু দ্য কিং ইন কাউন্সিল' নামে যে স্মারকপত্র দেন তাতে তিনি লেখেন, 'ইংরেজ জাতি মুসলমান স্বৈরশাসকদের উৎখাত করে বাংলার নিপীড়িত অধিবাসীদেরকে তাদের নিয়ন্ত্রণে নিয়েছে।... আপনার কর্তব্যপরায়ণ প্রজারা ইংরেজদেরকে কেবল বিজয়ী ভাবে না, মুক্তিদাতা ভাবে এবং আপনাকে কেবল শাসক ভাবে না, একইসঙ্গে মনে করে পিতা এবং রক্ষক' (রামমোহন, ১৯০৬, পৃ. ৪৪৬)। ১৮২৯ সালের ২১ জুন, ফরাসি প্রকৃতি বিজ্ঞানী ভিক্তর জাঁকমের সঙ্গে আলাপকালে রামমোহনের একই মনোভাব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তিনি বলেন, কোনো জাতি যখন একক প্রচেষ্টায় অধিক সংখ্যক মানুষের সুখ-সমৃদ্ধির লক্ষ্যে পৌঁছাতে অক্ষম হয় এবং দেশের অভ্যন্তরে ভবিষ্যৎ অগ্রগতির উপযুক্ত উপাদান উপস্থিত না থাকে, তখন এর থেকে উত্তম হলো অধিকতর সুসভ্য বিজেতা জাতির অভিজ্ঞতা দ্বারা পরিচালিত হওয়া এবং তাদের শাসনের অধিনে থাকা (দেবোত্তম, ২০২২, পৃ. ৩৬৮)। ভিক্তর জাঁকমের সঙ্গে আলাপ থেকে আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে, রামমোহন ইংরেজ জাতিকে ভারতীয়দের থেকে অধিকতর সুসভ্য ভাবতেন এবং ইংরেজদের বিজয় ও কর্তৃত্বকে আশীর্বাদ মনে করতেন, কারণ এর মাধ্যমে ভারতীয়রা ইংরেজদের কাছ থেকে সভ্যতার সুযোগগুলো গ্রহণ করতে পারবে। ভারতীয়রা যদি স্বাধীন হতেও চায়, সেই সময় যাতে তাদের হারাবার কিছু না থাকে সেজন্য তিনি বহু বছর ইংরেজ শাসনের অধীনে থাকার প্রয়োজন অনুভব করেন।

এসব ধারণা রামমোহনের চেতনা ও দৃষ্টিকে এতটাই আচ্ছন্ন রাখে যে ইংরেজ শাসন ও শোষণের নির্মম বাস্তবতাকে তিনি উপেক্ষা করে যান। কোম্পানির গড়ে তোলা সোসাইটি অব ট্রেড এদেশের লবণ ব্যবসায়ীদেরকে উৎখাত করে এই শিল্পকে প্রায় ধ্বংস করে ফেলে এবং বাণিজ্য করতে থাকে একচেটিয়াভাবে। এক সময় এদেশবাসীকে চালের দামের চেয়ে বারো গুণ বেশি দামে লবণ কিনতে হতো। এদেশের বস্ত্রশিল্প, রেশমশিল্পের পরিণতিও হয় একই রকম। ব্রিটিশ নীলকরদের মাধ্যমে এদেশের নীলচাষীরা ভূমিদাসে পরিণত হয় এবং তারা জমিতে বেগার খাটতে বাধ্য হয়। এসবের বিরুদ্ধে রামমোহনকে লড়াই করতে দেখা যায় না,

বরং বিদেশি নীলকরদের এদেশে জমি কেনার বিষয়ে রামমোহন এবং দ্বারকানাথ ঠাকুর ইতিবাচক ভূমিকা নেন। রামমোহন ইউরোপীয় নীলকরদের সমর্থন জানিয়ে এক নিবন্ধে লেখেন, 'তাহারদিগের নিজের ইংলন্ড ও ভারতবর্ষ উভয় স্থানে অতুল ঐশ্বর্য হইয়াছে আর ঐ নীলের কৃষিকর্মের প্রভাবে ভারতবর্ষের উর্বরা ও অনুর্বরা ভূমিসকলের ও অঞ্চলের গুণাগুণ প্রকাশ পাইয়াছে' (দেবোত্তম, ২০২২, পৃ. ২২৯)। নীলকরদের অত্যাচারের বিষয়ে বহু প্রমাণ পাওয়া যায় খোদ ইংরেজদের নথিপত্রেই, কিন্তু রামমোহনের কাছে এসবকিছু উপেক্ষিত থেকে যায়।

ইংরেজদের অর্থনৈতিক শোষণ ও অত্যাচার বিষয়ে রামমোহনের নীরবতার ব্যাখ্যা পাওয়া যায় তাঁর বন্ধু বাপ্তিস্ত মিশনারি উইলিয়াম অ্যাডামের এক বক্তৃতায়। সেই বক্তৃতায় অ্যাডাম বলেন, 'ইংরেজ শাসকদের স্বার্থপর, নিষ্ঠুর এবং বিকারগ্রস্ত ত্রুটিগুলো রামমোহনের মতো তীক্ষ্ণ মন ও স্থানীয় জ্ঞানসম্পন্ন লোকের পক্ষে দেখতে না পাওয়ার কথা নয়। কিন্তু তিনি মনে করতেন, ইংরেজদের সরকার ব্যবস্থা ও পদ্ধতিতে থাকা মুক্তির উপাদানগুলো এদেশীয় সরকারে পাওয়া যাবে না। তাই উৎখাত না করে বিদেশি সরকারকে তিনি সংস্কার ও উন্নত করার চেষ্টা করেন যাতে তাদের অধীনে থাকা প্রজাদের মধ্যে ক্ষোভ ও অসন্তোষ দানা না বাধে। তিনি সংগ্রাম করেছেন এদেশের মানুষকে একটি বিশুদ্ধ ধর্ম ও আলোকিত শিক্ষা দিতে, যাতে তারা আরও বৃহত্তর পরিসরে তাদের নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার লাভের জন্য উপযোগী হয়ে ওঠে' (অ্যাডাম, ১৮৭৯, পৃ. ২৬-২৭)। এই বক্তৃতায় তিনি আরও বলেন, রামমোহন স্বীকার করতেন, এদেশবাসী জাতীয় স্বাধীনতার উপযোগী নয়, তারা আত্ম-শাসনে অসমর্থ। তিনি যেসব মহৎ মনের এবং দূরদর্শী ইংরেজের সংস্পর্শে এসেছেন তারা মনে করেন, সবচেয়ে বিচক্ষণ এবং মর্যাদাকর, সবচেয়ে ন্যায্য ও মানবিক কার্যক্রম তারা ভারতীয়দের জন্য অনুসরণ করতে পারেন।

ইউরোপীয়দের ভারতে বসতি স্থাপন বিষয়ে হাউজ অব কমন্সের প্রতিবেদনে রামমোহনের যে মতামত ছাপা হয় তাতেও একই রকম মনোভাব আমরা দেখতে পাই। তিনি বলছেন, ইউরোপীয়রা এদেশে জমি কিনে বসতি স্থাপন করলে জমি চাষ ও উৎপাদন বৃদ্ধির নতুন ধরনের সঙ্গে এদেশীয়দের পরিচয় ঘটবে, যেমন ঘটেছে নীলচাষের ক্ষেত্রে। তাদের সংস্পর্শে থাকার কারণে এদেশীয়দের মন থেকে ধীরে ধীরে সব কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস দূর হবে, আইন ও বিচার ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটবে এবং সারাদেশে ইংরেজি শিক্ষার প্রসার ঘটবে। একসময় দুটো দেশ যদি বিচ্ছিন্নও হয়ে যায়, এদেশে ইউরোপীয়ের যে ইংরেজিভাষী, খ্রিষ্টান বংশধর রয়ে যাবে, যাদের থাকবে উচ্চতর বৈজ্ঞানিক, যন্ত্রকৌশলগত ও রাজনৈতিক জ্ঞান,

তারা প্রাচ্যের বড় সাম্রাজ্যকে অন্যান্য ইউরোপীয় দেশের স্তরে উন্নীত করবে এবং এমনকি আশেপাশের এশীয় জাতিকেও আলোকিত ও সভ্য করে তুলবে (রামমোহন, ১৯০৬, পৃ. ৩১৫-৩১৬)।

এই আলোকায়নের আকাঙ্ক্ষা রামমোহনের শিক্ষা সংস্কার সংক্রান্ত ভাবনাকেও আচ্ছন্ন করে। তাঁর বিশ্বাস ছিল, জগতের নিয়ম জানা, কর্তব্য নির্ণয় এবং সমাজকে উন্নততর করার জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান, যা আছে ইংরেজদের শিক্ষা ব্যবস্থায়। কাজেই তিনি সংস্কৃত কলেজ স্থাপনের বিপরীতে ইংরেজি কলেজ স্থাপনের দাবি তুলবেন সেটাই স্বাভাবিক।

১৮১১ সালে গভর্নর জেনারেল মিন্টো এদেশে শিক্ষা বিস্তারের জন্য কাশীর কলেজের অতিরিক্ত আরও দুটি সংস্কৃত কলেজ স্থাপনের পরামর্শ দেন। ভদ্র ইংরেজরা তখন সংস্কৃত জ্ঞান থাকাকে সম্ভ্রম লাভের উপায় ভাবতেন এবং সংস্কৃত কলেজ স্থাপনের ব্যাপারে যারা লর্ড মিন্টোর পরামর্শক ছিলেন, যেমন কোলব্রুক, এইচ. উইলসন, জেমস ও টোবি, হে ম্যাকনাটেন, সদরল্যান্ড প্রমূখ, সবাই ছিলেন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত (শিবনাথ, ১৯০৯, পৃ. ৭৭)। সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার তোড়জোড়ের এই সময় রামমোহন ইংরেজি কলেজ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন এবং সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হাইড ইস্ট, ডেভিড হেয়ার প্রমুখের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজ স্থাপন করেন। এই কলেজে মূলত পশ্চিমা বিজ্ঞান, ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য পড়ানো হতো।

অন্যদিকে, সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার চেষ্টাও চলতে থাকে। ১৮২৩ সালে কলকাতায় এই কলেজ প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব দেওয়া হয় পাবলিক ইনস্ট্রাকশন কমিটির উপর। ওই বছর লর্ড আমহর্স্ট গভর্নর জেনারেল হয়ে আসেন এবং রামমোহন সংস্কৃত কলেজের পরিবর্তে ইংরেজি কলেজ প্রতিষ্ঠার যুক্তি ও পরামর্শ তুলে ধরে আমহর্স্টকে একটা চিঠি লেখেন। সেই চিঠির মূল প্রতিপাদ্য ছিল, সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার মানে হলো ভারতকে অন্ধকারে নিমজ্জিত রাখা। এদেশীয়দের উন্নতি যদি সরকারের লক্ষ্য হয়, তবে আরও উদারনৈতিক ও আলোকময় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা কাম্য, যেখানে গণিত, প্রাকৃতিক দর্শন, রসায়নবিদ্যা, শরীরসংস্থানবিদ্যাসহ অন্যান্য দরকারি বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হবে (রামমোহন, ১৯০৬, পৃ. ৪৭৪)। ওই চিঠিতে সংস্কৃত সাহিত্য সম্পর্কে রামমোহনের চরম অবজ্ঞা ও ঔদাসীন্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তিনি বলেন, এতে (সংস্কৃত সাহিত্যে) সারগর্ভ কিছুই নেই, ভাষা দুরূহ এবং এতে আছে নানা রকম ভ্রান্তি, কল্পনা এবং কুসংস্কার। ইউরোকেন্দ্রিক ভাবনা কেবল সংস্কৃত সাহিত্য

ব্যাপারে নয়, ভারতীয় সভ্যতার সব অতীত উপাদানের সঙ্গেই রামমোহনকে চৈতন্যগত দিক থেকে বিযুক্ত করে তোলে।

২. রামমোহনের দার্শনিক চিন্তার নির্মাণ

রামমোহন রায় ১৮০৩-৪ সালে *তুহ্ফত্-উল-মুওয়াহিদ্দিন* নামে ফার্সি ভাষায় একটি বই লেখেন। এ বইয়ে তিনি ক্ষুরধার যুক্তি প্রয়োগ করে বিভিন্ন ধর্মের নীতি এবং 'প্রায় স্বতঃসিদ্ধ' মতগুলোকে বিচার-বিশ্লেষণ করেন। তিনি দেখান, ধর্মের এসব বিশ্বাস এবং বিধি-নিষেধগুলোর উদ্ভব ঘটে অভ্যাস এবং দলগত শিক্ষা থেকে। একারণে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের এসব বিশ্বাস ও আচরণীয়ের মধ্যে বিরোধ দেখা যায়। কিন্তু তর্কবিচারে এসব পরস্পর বিরোধী মত ও আচরণ একইসঙ্গে ভ্রান্ত ও অভ্রান্ত হতে পারে না।

রামমোহন যুক্তির অবিরোধ নীতি (principle of non-contradiction) এবং পর্যাপ্ত কারণ নীতি (principle of sufficient reason) প্রয়োগ করে বিভিন্ন ধর্মের সঙ্গে যুক্ত অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার, অলৌকিকতা এবং ক্ষতিকর পরম্পরাগুলোকে খারিজ করে দেন, এমনকি প্রত্যাদেশকেও তিনি উল্লেখ করেন মনগড়া বলে। তিনি বলেন, সব ধর্মের মধ্যে সাধারণভাবে যা আছে সেটি হলো জগতের আদিকারণ হিসেবে এক অনন্ত সত্তায় বিশ্বাস, অবশিষ্ট সবকিছুই হলো অভ্যাস। এক্ষেত্রে তিনি 'অভ্যাস' থেকে 'স্বভাব'কে আলাদা করেন। স্বভাব বলতে তিনি বুঝেছেন জগৎসত্তায় নিহিত থাকা স্বরূপকে। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, জগতের কারণরূপী সেই অনন্ত সত্তাকে দার্শনিকভাবে প্রতিষ্ঠা করা এবং তার সঙ্গে মানুষের কর্তব্য ও কর্মনিষ্ঠাকে যুক্ত করা। তুহ্ফত্-এর শেষ দিকে তিনি বলেন, জাতি, বর্ণ ও ধর্ম নির্বিশেষে সব মানুষের হৃদয় পরস্পরের প্রতি প্রীতি ও ভালোবাসা দিয়ে জয় করাই প্রকৃতির সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের নিকট গ্রহণীয় বিশুদ্ধ পূজা (রামমোহন, ১৯৭৩, পৃ. ৭২৪-২৯)।

কিন্তু প্রশ্ন হলো, এক অনন্ত সত্তার অস্তিত্বের সঙ্গে ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সব মানুষের পারস্পরিক 'প্রীতি ও ভালোবাসা'র সম্পর্ক কী? অন্তত এই দুয়ের সম্পর্ককে দার্শনিকভাবে কীভাবে যুক্ত করে দেখা যায়? অর্থাৎ অদ্বৈত পরম সত্তার অস্তিত্ব থেকে নৈতিক কর্তব্য যৌক্তিকভাবে কী করে ধার্য হতে পারে? আমরা দেখতে পাব, তুহ্ফত্ পরবর্তী রামমোহন তাঁর বেদান্তচর্চায় এই প্রশ্নের মীমাংসার দিকে অগ্রসর হবেন এবং এমন একটি বিশ্বতাত্ত্বিক দৃষ্টি খুঁজে বের করবেন যাতে তাঁর অধিবিদ্যক অবস্থানের সঙ্গে নৈতিক অবস্থানের একটা যুক্ততা তৈরি হয়।

রামমোহন ১৮১৫ সালে রংপুর থেকে কলকাতায় ফিরে সংস্কৃত সাহিত্য, বিশেষত উপনিষদ পাঠ ও অনুবাদ শুরু করেন। এসময় ঔপনিষদিক অদ্বৈতবাদ তাঁকে বিস্মিত ও অভিভূত করে। তিনি যে সময় বেদান্ত চর্চা শুরু করেন, তখন বাংলা অঞ্চলের টোলগুলোতে খুব অল্পসংখ্যক বিদ্যার্থীই বেদান্ত পড়ত এবং তারা যেসব বই পড়ত, তার বেশির ভাগই ছিল অদ্বৈত বেদান্ত ধারার। তখন মূল উপনিষদগুলো পণ্ডিতদের কাছে এতটাই অপরিচিত ছিল যে, কোনো কোনো পণ্ডিত অভিযোগ করেন, উপনিষদ বলে কোনো সংস্কৃত শাস্ত্রই নেই– ঈশ, কঠ ইত্যাদি রামমোহনেরই লেখা (প্রমথ, ১৯৬৮, পৃ. ১৫৭)। কাজেই রামমোহন যে বেদান্তকে নতুন করে আবিষ্কার করেন তাতে সন্দেহ নেই।

তুহ্ফত্-এ রামমোহন সত্যাগ্রহী তর্কের মাধ্যমে ধর্মের পরস্পরবিরোধী অভ্যাস বা কুপ্রথাগুলোর বিরুদ্ধে যুক্তি দেন। তাঁর এ লড়াই শুরু হয়েছিল বেশ আগেই, ১৬ বছর বয়সে। সেই সময় হিন্দুদের পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে একটা পুস্তিকা লেখার কারণে তাঁর পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে বিরোধ সৃষ্টি হয় এবং তিনি গৃহত্যাগ করেন। তুহ্ফত্ পরবর্তী রামমোহনে আমরা সেই লড়াইকে আরও বিস্তৃত ও জোরালো হতে দেখি। তিনি পৌত্তলিকতা, সতীদাহ ইত্যাদি অযৌক্তিক ও অমানবিক প্রথার বিরুদ্ধে যুক্তির পাশাপাশি শাস্ত্রের প্রমাণকেও সামনে আনেন।

অভ্যাস-এর বিপরীতে স্বভাব সম্পর্কিত যে দার্শনিক অনুসন্ধান, সেটি রামমোহনের বেদান্তচর্চার একটি প্রধান উদ্দেশ্য হয়ে ওঠে। সে কারণে বৈদিক জ্ঞানকাণ্ড বা পরাবিদ্যাকে তিনি তাঁর প্রধান ক্ষেত্র বলে বিবেচনা করেন। অপরাবিদ্যা বা বৈদিক যাগ-যজ্ঞ, পূজার্চনা ইত্যাদিকে বরাবরই তিনি গৌণ বলে ভেবেছেন। শ্রুতি প্রমাণের ভিত্তিতেও রামমোহন পরাবিদ্যার চেয়ে অপরাবিদ্যাকে নিকৃষ্ট ভাবতেন (দিলীপকুমার, ১৯৯৯, পৃ. ১৩০)। কাজেই রামমোহনের ধর্মসংস্কারের মূলসূত্র ছিল এমন একটা দার্শনিক অবস্থান দাঁড় করানো যা একটি সর্বজনীন ধর্মের জ্ঞানগত ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে।

রামমোহনের পরাবিদ্যার হাতিয়ার হয়ে ওঠে যুক্তিবিচার, শাস্ত্র, প্রত্যক্ষপ্রমাণ এবং কাণ্ডজ্ঞান। তিনি ধর্মবিচার ও কর্তব্য নির্ধারণে সব সময় যুক্তি প্রয়োগ করেছেন এবং 'গোস্বামীর সহিত বিচার' লেখায় বৃহস্পতিবচন উল্লেখ করে তিনি বলেন (রামমোহন, ১৯৭৩, পৃ. ১৬৪):

> কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্তব্যো বিনির্ণয়ঃ।
> যুক্তিহীনবিচারেণ ধর্মহানিঃ প্রজায়তে॥

অর্থাৎ কেবল শাস্ত্রনির্ভরতা দিয়ে ধর্মাচার ও কর্তব্য নির্ধারণ করা যায় না। যুক্তিহীন বিচারে ধর্মহানি ঘটে। কিন্তু পরাবিদ্যার প্রধান বিষয় যেহেতু ব্রহ্মজ্ঞান এবং পরব্রহ্ম যেহেতু অজ্ঞেয় ও অনির্বচনীয়, তাই কেবল যুক্তি দিয়ে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা যাবে না। এ কারণে তিনি যুক্তির পাশাপাশি শাস্ত্রকেও প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করেন এবং শাস্ত্রকে যুক্তির সমান মর্যাদা দেন।

কেনোপনিষদের ইংরেজি অনুবাদের ভূমিকায় রামমোহন বিষয়টা পরিষ্কার করেন এভাবে যে, পরম্পরাগত মতবিরোধ দূর করতে যুক্তি যতোটা কার্যকর ব্রহ্মপ্রতিপাদনে সেটা ততটাই অসম্পূর্ণ, কেবল যুক্তি প্রয়োগে আমরা সর্বজনীন সংশয়ে পতিত হই। কাজেই আমরা যদি স্বাচ্ছন্দ্য ও সুখের নীতি মেনে নিই তাহলে উত্তম পদ্ধতি হবে একইসঙ্গে শাস্ত্র ও যুক্তির ব্যবহার করা (রামমোহন, ১৯০৬, পৃ. ৩৭)। আমরা দেখতে পাচ্ছি, তুহ্ফত্-এ যে যুক্তিবাদী রামমোহনকে দেখা গিয়েছিল তিনি অনেকটাই বদলে গেছেন এবং শাস্ত্র অর্থাৎ বেদ-বেদান্ত ও স্মৃতি, বিশেষত মনুস্মৃতিকে তিনি যুক্তির সমান গুরুত্ব দিচ্ছেন।

শাস্ত্র ও যুক্তির পাশাপাশি রামমোহন প্রত্যক্ষকেও প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করেন। তুহ্ফত্-এ তিনি নিশ্চিত জ্ঞান (positive knowledge) হিসেবে নিয়েছেন বাহিরীন্দ্রিয়ের জ্ঞানকে (রামমোহন, ১৯৭৩, পৃ. ৭২৪)। অন্যদিকে প্রমাণ হিসেবে কাণ্ডজ্ঞানও (common sense) তাঁর কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। *বেদান্তসার*-এর ইংরেজি অনুবাদের ভূমিকায় তিনি অনন্ত মহাজগতের শাসক ও নির্বাহী হিসেবে পরমেশ্বরের বিশ্বাসে পৌঁছাতে সঠিক যুক্তি এবং কাণ্ডজ্ঞানের নির্দেশের কথা বলেন (রামমোহন, ১৯০৬, পৃ. ৪)। 'দি সেকেন্ড ডিফেন্স অব মনোথেয়িস্টিক্যাল সিস্টেম' নামের লেখাটিতে আছে কাণ্ডজ্ঞানের প্রসঙ্গ (রামমোহন, ১৯০৬, পৃ. ১১৪)। এছাড়া লন্ডনে ইউনিটারিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সভায় দেওয়া বক্তৃতার অনুলিপিতে জ্ঞানের উৎস হিসেবে কাণ্ডজ্ঞান কথাটির উল্লেখ আছে। রণজিৎ গুহ বলেন, রামমোহন শাস্ত্র ও যুক্তির মতো কাণ্ডজ্ঞানকেও একই সারিতে রাখেন (রণজিৎ, ২০১০, পৃ. ৪২)।

রণজিৎ গুহ কাণ্ডজ্ঞানকে দেখেছেন প্রাগভিজ্ঞা (a priori) হিসেবে। তিনি কাণ্ডজ্ঞানের সঙ্গে বুদ্ধির তুলনা করে বলেন, বুদ্ধির বিচার বহির্মুখী, অর্থাৎ বুদ্ধি প্রমাণের ভিত্তিতে সত্য-মিথ্যা ভালো-মন্দ যাচাই করে, সেখানে বিচারক ও বিচার্যের ভেদ আছে। কিন্তু কাণ্ডজ্ঞানের অনুভবে এই ভেদ নেই (রণজিৎ, ২০১০, পৃ. ৪২)। কাজেই কাণ্ডজ্ঞানে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়বস্তুর এক প্রকার অভেদাবস্থা থাকে। যেকোনো অভিজ্ঞতাকে বুঝতে হলে তার পেছনে থাকা কারণ অনুসন্ধান করতে হয়, কিন্তু কাণ্ডজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই হেতুজন্যতা নেই। একারণে রণজিৎ গুহ

একে প্রাগভিজ্ঞা বলে স্থির করেন। কাণ্ডজ্ঞানকে তিনি বলেন লৌকিক জ্ঞান। কেউ কেউ একে সহজ বুদ্ধি বলেও উল্লেখ করেছেন। তবে কাণ্ডজ্ঞান সহজাত বা অভিজ্ঞতাপূর্ব কিনা তা নিয়ে সংশয় আছে। কারণ কাণ্ডজ্ঞান সহজাত বা প্রাগভিজ্ঞ হলে সবার ক্ষেত্রে এর ভূমিকা একই হওয়ার কথা, কিন্তু অভিজ্ঞ এবং অনভিজ্ঞ লোকের ক্ষেত্রে এতে পার্থক্য দেখা যায়। কাণ্ডজ্ঞানকে বরং অভিজ্ঞতার এক জটিল রসায়ন হিসেবে দেখা যায়, এটি হয় অভিজ্ঞতারই এক সাধারণ রূপ যা তাৎক্ষণিক উপলব্ধি সৃষ্টি করে।

আমরা লক্ষ করি, রামমোহন একজন সংস্কারক এবং মীমাংসক হিসেবে জ্ঞানের সব প্রমাণকেই কাজে লাগিয়েছেন। তাঁর সমকালীন পণ্ডিতদের সঙ্গে ব্রহ্ম প্রতিপাদন, শাস্ত্র ব্যাখ্যা ও কর্তব্য নির্ণয় নিয়ে তর্কবিচার করতে গিয়ে এসব প্রমাণকে তিনি কাজে লাগিয়েছেন সমান গুরুত্ব দিয়ে।

রামমোহনের সমকালীন প্রতিপক্ষ যারা ছিলেন তাঁদের একজন মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার। তিনি *বেদান্ত চন্দ্রিকা* নামে একটি পুস্তিকায় রামমোহনের মত বিষয়ে নানা অভিযোগ উত্থাপন করেন এবং রামমোহন এসব অভিযোগের একাধিক জবাব দেন। এই জবাবগুলো থেকে রামমোহনের দার্শনিক অবস্থান অনেকটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বিদ্যালঙ্কার তাঁর *বেদান্ত চন্দ্রিকায়* ব্রহ্ম ও বস্তুর সম্বন্ধ বিষয়ে রামমোহনের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে বলেন, 'যিনি সামান্য ভেদজ্ঞান করেন, অর্থাৎ কখনো মনে করেন যে, এই বস্তু ব্রহ্ম থেকে আলাদা, তার মনে তখন ভয় জন্মে, অর্থাৎ তার কখনো অভয়ব্রহ্মপ্রাপ্তি ঘটে না, এ কথা স্বয়ং বেদ বলছে' (রামমোহন, ১৯৭৩, পৃ. ৬২৫)। রামমোহন এ অভিযোগের জবাবে বলছেন, 'ব্রহ্মে বিশ্বাস কোনোভাবেই এমন বিশ্বাস না যে, ব্রহ্ম বস্তুর সঙ্গে যুক্ত। ব্রহ্মের অস্তিত্বে যাদের আস্থা আছে এবং যাদের কাণ্ডজ্ঞান আছে, তারা নিঃসন্দেহে বস্তুগত সম্বন্ধ বিচারে তার অস্তিত্বের স্বরূপ এবং ধরন বিষয়ে নিজের অজ্ঞতা স্বীকার করবে। কাজেই ব্রহ্মের অস্তিত্বে বিশ্বাস থাকা মানেই কী করে এটা হয় যে, ব্রহ্ম বস্তুর সঙ্গে যুক্ত?' (রামমোহন, ১৯০৬, পৃ. ১১৪) অর্থাৎ রামমোহনের বক্তব্য হলো, ব্রহ্মের স্বরূপ অজ্ঞেয়, যদিও এই অজ্ঞেয়তার মানে তার অস্তিত্বে অবিশ্বাস নয় এবং তার অস্তিত্বে বিশ্বাস থাকা মানে তাকে বস্তুর সঙ্গে যুক্ত করা নয়।

রামমোহন তাঁর *সেকেন্ড ডিফেন্স*-এ মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারকে উল্লেখ করেন বিদগ্ধ ব্রাহ্মণ (learned Brahman) বলে। এই পণ্ডিত দ্রব্য ও গুণের সম্বন্ধ বিচার প্রসঙ্গে বলেন, 'দ্রব্য ছাড়া স্বতন্ত্রভাবে গুণের অস্তিত্ব থাকতে পারে না, কিন্তু দ্রব্য যেকোনো গুণের অস্তিত্ব ব্যতিরেকে অস্তিত্বশীল থাকতে পারে।' এ মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে রামমোহন বলেন, 'অনুভূতিসম্পন্ন

যেকোনো লোক এটা স্বীকার করবে যে, কোনো দ্রব্য তার অস্তিত্বশীলতার জন্য গুণ বা তটস্থ লক্ষণগুলোর উপর নির্ভরশীল। কিন্তু গুণ থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো দ্রব্য এমনকি কল্পনারও অতীত' (রামমোহন, ১৯০৬, পৃ. ১১৪)। রামমোহনের এই অবস্থান একজন মূর্ত অদ্বৈতবাদীর। এই অবস্থান তাঁকে শঙ্করাচার্যের বেদান্ত ভাষ্য থেকে অনেকটা আলাদা করে ফেলেছে।

বিদগ্ধ ব্রাহ্মণ এবার প্রমেয় বিষয়ের সঙ্গে প্রমাণকে যুক্ত করে অভিযোগটির বিস্তার ঘটান। তিনি বলেন, 'আপনি মানব অস্তিত্বের সঙ্গে যুক্ত বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করেন, কারণ তা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, কিন্তু ব্রহ্মের সাপেক্ষে তা স্বীকার করেন না, কারণ তা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়। এই যদি আপনার যুক্তি-পদ্ধতি হয়, তাহলে এটা স্পষ্ট যে আপনার অবস্থা কেবল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর সীমাতেই আবদ্ধ থাকবে (রামমোহন, ১৯০৬, পৃ. ১১৫)। এর জবাবে রামমোহন বলছেন, 'আমি স্রেফ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতার বিচারে কখনো ব্রহ্মের বস্তুকতাকে অস্বীকার করিনি। আগের লেখাগুলোতে আমি উল্লেখ করেছি, ব্রহ্মস্বভাব বাহিরীন্দ্রিয় ও অন্তরীন্দ্রিয়ের উপলব্ধির অতীত। কেবল নিরাকার বলার কারণে এটা প্রতীয়মান হয় না যে ব্রহ্মের বস্তুকতাকে আমি অস্বীকার করেছি এবং এটাও না যে আমার আস্থা কেবল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুতেই সীমাবদ্ধ' (রামমোহন, ১৯০৬, পৃ. ১১৬)। রামমোহন দৃষ্টান্ত দেখিয়ে বলেন, আমাদের চারপাশে এমন বহুকিছু আছে যা ইন্দ্রিয় উপলব্ধির অতীত, কিন্তু অনুমান দিয়ে সিদ্ধ, যেমন চাঁদ, পৃথিবী ও সূর্যের ভেতরকার পারস্পরিক মহাকর্ষ বল, ইন্দ্রিয়লব্ধ না হলেও আমরা অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে একে অনুমান করতে পারি। রামমোহন বলেন, ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা এবং বুদ্ধি– উভয় দিয়ে অপ্রমাণিত হলেই কেবল কোনোকিছু অস্বীকৃত হতে পারে, শুধু ইন্দ্রিয়ের স্বাক্ষ্যের ভিত্তিতে কোনোকিছু অস্বীকৃত হওয়া সঙ্গত নয় (রামমোহন, ১৯০৬, পৃ. ১১৬)।

রামমোহন বিশ্বাস করেন, ব্রহ্ম অবর্ণনীয় (indescribable)। এ প্রসঙ্গে বিদগ্ধ ব্রাহ্মণের অভিযোগ, ব্রহ্মকে যদি কেউ বলেন 'অবর্ণনীয়' এবং একই সঙ্গে বলেন অস্তিত্বশীল, তাহলে তিনি ব্রহ্মকে জগতের মতোই পরিবর্তনশীল হিসেবে উপলব্ধি করবেন (রামমোহন, ১৯০৬, পৃ. ১২১)। জবাবে রামমোহন বলছেন, ব্রহ্ম অবর্ণনীয় কারণ কোনো ভাষিক পদ কোনোকিছুর ধারণা তখনই প্রকাশ করতে পারে, যখন তা ইতোমধ্যে জ্ঞাত। কিন্তু ব্রহ্মের এসব বস্তুগত দশা নেই। একারণে বেদ ব্রহ্মকে প্রকাশ করেছে নেতিবাচক পরিভাষা দিয়ে, অর্থাৎ ব্রহ্ম কী নয়, সেটাই উল্লেখ করা হয়েছে, যেমন মানসিক বৃত্তি বা বহিরীন্দ্রিয় দিয়ে যাকে উপলব্ধি করা যায়, তা ব্রহ্ম নয় (রামমোহন, ১৯০৬, পৃ. ১২২)। রামমোহন অন্য একটি লেখায় ব্রহ্মের অস্তিত্ব অনুমান এবং তথাপি তার স্বরূপকে না জানার ব্যাপারে একটি

দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেন, দেহের কর্মকাণ্ড থেকে জীবাত্মার অস্তিত্ব অনুমান করা যায়, কিন্তু জীবাত্মার স্বরূপকে কখনো জানা যায় না (রামমোহন, ১৯০৬, পৃ. ১৩৬)।

বিদগ্ধ ব্রাহ্মণের আরও দুটি চমকপ্রদ প্রসঙ্গের মধ্যে একটি ছিল আত্মসত্তা সম্পর্কিত প্রশ্ন। তিনি প্রশ্ন করেন, 'আপনি নিজে কে?' এবং অন্যটি ছিল, মানুষকে নৈতিক দায়িত্বসম্পন্ন কর্তা হিসেবে কীভাবে দেখা যায়? প্রথম প্রশ্নটির জবাবে রামমোহন বলেন, তিনি নিজে একজন সাপেক্ষ (dependent) সৃষ্টি, ক্ষণজীবী এবং যার নিশ্চিত ধ্বংস আছে। অন্য প্রসঙ্গ, অর্থাৎ অদ্বৈত বেদান্ত মত অনুসারে ব্যক্তিকে কী করে নৈতিক দায়িত্বসম্পন্ন কর্তা হিসেবে দেখা যায়, তার মীমাংসায় রামমোহন বলেন, তিনি কখনোই মনে করেন না যে মানুষ নৈতিক কর্তা (moral agent) নয়। বেদান্ত মতে, ঈশ্বর সর্বময় এবং সবকিছুর অস্তিত্ব নিহিত আছে ঈশ্বরে, অর্থাৎ এমন কোনোকিছু নেই, যাতে ঈশ্বরের উপস্থিতি নেই এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা ছাড়া কোনোকিছু বাস্তব অস্তিত্ব লাভ করে না। ঈশ্বরের এই সার্বভৌম ইচ্ছার পরিস্থিতিতেই হয়ত বিদগ্ধ ব্রাহ্মণ ব্যক্তির কর্মের স্বাধীনতা তথা নৈতিক কর্তা হিসেবে ব্যক্তি অস্তিত্বের প্রশ্নটি তুলেছিলেন। কিন্তু রামমোহন এই প্রসঙ্গটি শাস্ত্রের উপর ছেড়ে দেন এবং বলেন, বেদান্ত মতে, ব্যক্তির 'বিশেষ চরিত্র ও তার প্রাপ্য শ্রদ্ধা'র স্বীকৃতি আছে (রামমোহন ১৯০৬, পৃ. ১২৩)। তবে রামমোহন অন্য এক লেখায় একটি উপমার সাহায্যে জীব ও পরমাত্মার স্বাতন্ত্র এবং নৈতিক কর্তা হিসেবে ব্যক্তির হিতাহিত ভোগের ব্যাখ্যা দেন। তিনি *ব্রাহ্মণ সেবধি*-তে (রামমোহন, ১৯৭৩, পৃ. ২৩৬) এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, জলপূর্ণ নানা পাত্রে যেমন একই সূর্য প্রতিবিম্বিত হয়, তেমনই প্রপঞ্চের জগতে পরমাত্মা প্রতিবিম্বিত হচ্ছেন। জলের কম্পনে প্রতিবিম্ব কম্পিত হলেও তাতে সূর্য কম্পিত হয় না। একইভাবে জীবাত্মার হিতাহিত ভোগ পরমেশ্বরকে স্পর্শ করে না। জলের মলিনতা ও নির্মলতার কারণে যেমন প্রতিবিম্ব মলিন বা স্বচ্ছ হয়, সেরকমই ইন্দ্রিয়সমূহের তারতম্যের কারণে জীবের স্ফূর্তির ভেদাভেদ ঘটে। এভাবে জীব পৃথক পৃথক কর্মফল ভোগ করে।

প্রতিপক্ষের অভিযোগ খণ্ডন থেকে রামমোহনের অধিবিদ্যক অবস্থান দাঁড়ায় এরকম, পৃ. ব্রহ্মের অস্তিত্ব আছে, কিন্তু বস্তুসত্তার সঙ্গে তার সম্বন্ধ অনির্ণেয়। অস্তিত্ব থাকার অর্থ এই নয় যে, তা বস্তুর সঙ্গে যুক্ত। ব্রহ্ম ইন্দ্রিয় উপলব্ধির অতীত এবং ভাষায় অবর্ণনীয়। অনুমান ও কাণ্ডজ্ঞান থেকে তার অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায়। দ্রব্য হিসেবে ব্রহ্মের অস্তিত্ব তার গুণ-লক্ষণ ছাড়া অকল্পনীয়। দেহের কর্মকাণ্ড থেকে যেমন জীবাত্মার অস্তিত্ব অনুমান করা যায়, তেমনই গুণ-লক্ষণ থেকে দ্রব্য হিসেবে ব্রহ্মের অস্তিত্ব আমরা কল্পনা করে নিতে পারি। বিদ্যালঙ্কারের অভিযোগ থেকে ধরে নেওয়া যায়, জীব ও জগৎকে রামমোহন আপেক্ষিক বা নির্ভরশীল সত্তা

হিসেবে দেখেছেন এবং 'মায়া'র অর্থ এটাই যে এই জীব-জগৎ সাপেক্ষ সত্তা, ক্ষণজীবী এবং নশ্বর। তবে আপেক্ষিক এই জগতের ব্যবহারিক মূল্য আছে এবং নৈতিক কর্তা হিসেবে মানুষের কর্মকাণ্ডেরও মূল্য রয়েছে।

কাজেই মায়া কথাটির অর্থ রামমোহনের চিন্তায় বদলে গেছে অনেকখানি। জীবন ও জগতের অস্তিত্ব ব্রহ্মনির্ভর বলেই তা মিথ্যা নয় এবং তাতে জাগতিক কর্মকাণ্ডও মিথ্যা হয়ে যায় না। জীব ও জগৎ পরব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ বলেই রামমোহন জগৎকার্য ও সমাজকর্মকে ব্রহ্মোপাসনার সঙ্গে যুক্ত করেন। এবং তিনি উপাসনা কথাটির অর্থও বদলে দেন। এক শিষ্যের প্রশ্নের জবাবে রামমোহন বলেন, 'অন্যের তুষ্টির জন্য যত্নবান হওয়াই উপাসনা। পরব্রহ্মের দিক থেকে দেখলে এটি হলো, তার গুণাবলির প্রতি ধ্যান' (রামোহন, ১৯০৬, পৃ. ১৩৫)। কাজেই ব্যক্তির দিক থেকে উপাসনার অর্থ দাঁড়ায় আত্ম অন্বেষণ এবং জগৎসত্তার ধ্যানের ভেতর দিয়ে ব্রহ্ম উপলব্ধি এবং সামাজিক দিক থেকে উপাসনার অর্থ দাঁড়ায় অন্যের প্রতি কর্তব্য পালন। কীভাবে উপাসনা করতে হবে এই প্রশ্নের জবাবে রামমোহন বলেন, ইন্দ্রিয় দমনের মাধ্যমে জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয় ও অন্তকরণকে এমনভাবে চালিত করতে হবে যেন নিজের বা অন্যের বিঘ্ন না ঘটে। কেউ নিজের জন্য যে ব্যবহারকে অযোগ্য ভাবেন, যেন তিনি অন্যের জন্যেও একই রকম ভাবেন (রামমোহন, ১৯০৬, পৃ. ১৩৭)। সুতরাং রামমোহন উপাসনা পরিভাষাটির যে মানে দাঁড় করিয়েছেন তাতে জ্ঞান ও কর্তব্যের সমন্বয় ঘটেছে এবং একটি আরেকটির পরিপূরক হয়ে উঠেছে।

রামমোহন বেদান্ত ব্যাখ্যায় শঙ্করাচার্যের অনুসারী হলেও তাঁর প্রহেলিকার জগৎটি রামমোহনের কাছে একটি বাস্তবসম্মত ব্যবহারিক জগতে পরিণত হয়েছে। কোনো কোনো গবেষক মনে করেন, জগৎকে বাস্তব হিসেবে দেখার ক্ষেত্রে রামমোহনের চিন্তায় তন্ত্রের প্রভাব ছিল, যেমন দিলীপ কুমার বিশ্বাস বলেন, অদ্বৈতবাদ ত্যাগ না করেও তান্ত্রিক শক্তিবাদকে আশ্রয় করে তিনি এই মতবাদকে যথেষ্ট পরিমাণে মার্জিত ও যুগোপযোগী করে তুলেছিলেন (দিলীপ, ১৯৯৯, পৃ. ১৪৯)। শঙ্করাচার্যের মতে, কেবল সন্ন্যাস আশ্রমেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা সম্ভব। অন্যদিকে রামমোহন বলেন, কেবল সন্ন্যাসীরাই মুক্ত নয়, গৃহস্থেরও মুক্তি হয়, গৃহস্থেরও আত্মোপাসনা কর্তব্য। শাস্ত্রের প্রমাণ এবং যুক্তি ব্যবহার করে রামমোহন প্রাত্যহিক গার্হস্থ্য জীবনকেও তাঁর ব্রহ্মবাদের সঙ্গে যুক্ত করেন এবং মূল্যবান করে তোলেন।

বেদান্ত শাস্ত্র অনুসরণ করে রামমোহন যে ব্রহ্ম প্রতিপাদন করেন তা সর্বময় এবং অদ্বৈত ব্রহ্ম, যদিও কখনো কখনো তার মত ঝুঁকে পড়েছে একেশ্বরবাদের দিকে, কিন্তু প্রধানত এটি

দার্শনিক একত্ববাদ। তবে অবশ্যই বিমূর্ত অদ্বৈতবাদ নয়। কারণ রামমোহনের মতে এই অদ্বৈত ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ হলো সমস্ত বিশ্বচরাচর– জড় এবং জীবজগৎ। মানুষ যখন ব্রহ্মের এই গুণাবলিকে উপলব্ধি করে তখন সেটাই ব্রহ্মোপলব্ধি এবং অন্যের সন্তুষ্টির জন্য কাজ করে তখন সেটাই ব্রহ্ম উপাসনা।

৩. রামমোহনের দর্শন ও সাংস্কৃতিক উপনিবেশায়ন

রামমোহন রায় শাস্ত্র, যুক্তি, কাণ্ডজ্ঞান ও প্রত্যক্ষপ্রমাণের সাহায্য নিয়ে যে মূর্ত অদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠা করেন, সেটাই ছিল তাঁর সর্বজনীন ধর্ম এবং ঐক্যসাধনার ভিত্তি। উনিশ শতকের যে সময়ে বেদান্ত চর্চার ধারা ক্ষীণ হয়ে এসেছিল তখন তিনি একজন নব্য মীমাংসকের ভূমিকা নিয়ে হাজির হন। এক্ষেত্রে এমন দাবি করা অমূলক হবে না যে ইউরোপীয় সাংস্কৃতিক উপনিবেশ তাঁকে এই মীমাংসকের ভূমিকায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। এই দাবির যথার্থতা বোঝা যাবে যদি আমরা তুহ্ফত্-এর রামমোহনের সঙ্গে পরবর্তীকালের বৈদান্তিক রামমোহনের তুলনা করে দেখি।

তুহ্ফত্-এ রামমোহন ছিলেন একজন কট্টর যুক্তিবাদী। তিনি শাস্ত্রের ঊর্ধ্বে থেকে যুক্তি প্রয়োগ করেছেন এবং লৌকিক জগতের পাশাপাশি প্রচলিত ধর্মের নীতি ও বিশ্বাসগুলোকেও যুক্তিবিচারের আওতায় এনেছেন। তিনি যুক্তিবিচারের আলোয় প্রত্যাদেশ, পরকাল ইত্যাদিকে বলেছেন মনগড়া। তুহ্ফত্-এর এই যুক্তিবাদ পাশ্চাত্যের প্রগতিপন্থি যুক্তিবাদ দিয়ে প্রভাবিত ছিল এমন দাবি করা যায় না, কারণ জন ডিগবির সাক্ষ্য মতে তখনও তিনি ভালো করে ইংরেজি জানতেন না। কিন্তু তুহ্ফত্ পরবর্তী রামমোহন যখন বেদান্ত চর্চা ও প্রচার শুরু করেন, আমরা দেখি, তিনি শাস্ত্র প্রমাণের উপর নির্ভর করতে শুরু করেছেন। মি. গর্ডনকে লেখা আত্মজীবনীমূলক চিঠিতে তিনি স্বীকার করেন, তাঁর প্রতিপক্ষ পণ্ডিতেরা শাস্ত্র মানেন এবং শাস্ত্রকে শ্রদ্ধা করেন, তাই তিনি যুক্তির পাশাপাশি শাস্ত্রকে ব্যবহার করেন (রামমোহন, ১৯০৬, পৃ. ২২৪) অর্থাৎ ব্যবহারিক উপযোগিতা ও কার্যকারিতার জায়গা থেকে তিনি শাস্ত্র ব্যবহার করেছেন। কিন্তু অচিরে তিনি নিজেও শাস্ত্রের প্রতি অনুগত হয়ে পড়েন এবং বলেন, শাস্ত্র ও যুক্তি সমার্থক। তর্ক বলতে তিনি মনুর বিধান অনুসারে বেদসম্মত তর্ক বা বেদের অবিরোধী তর্ককে বুঝতে শুরু করেন। এসময় শাস্ত্রকে তিনি কেবল পরাবিদ্যা লাভের উপায় হিসেবেই দেখেননি, তার কাছে বেদ হয়ে উঠছে নিত্য ও অনশ্বর এক সত্তা। রামমোহন তাঁর *বেদান্তসার* বইয়ের ইংরেজি অনুবাদের ভূমিকায় বলছেন, 'বেদ ধারণ করে আছে সমগ্র হিন্দু ধর্মতত্ত্ব, আইন ও সাহিত্য এবং এই বেদ হচ্ছে সৃষ্টির সমবয়সী (coeval) (রামমোহন,

১৯০৬, পৃ. ৩)। তুহ্ফত্-এর রামমোহন যে শাস্ত্রের বশ্যতা মেনে নিলেন তার মূলে আছে শাস্ত্রের উপযোগ। এ প্রসঙ্গে সুমিত সরকার বলেন, উপযোগবাদ এবং ধর্মের ঐহিকতাকে সমন্বিত করে তিনি বেদান্তকে ফিরিয়ে আনেন (সুমিত, ২০০০, পৃ. ১৪)। উপনিষদের ইংরেজি অনুবাদের ভূমিকায় রামমোহন নিজেও একথা স্বীকার করেছেন।

রামমোহন যে উপযোগবাদী জায়গা থেকে শাস্ত্রের বশ্যতা ও আনুগত্য মেনে নেন, সেই একই উপযোগবাদ কাজ করেছে তাঁর দার্শনিক অদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠার পেছনেও। তুহ্ফত্-এ আমরা অদ্বৈতবাদী চিন্তার একটা অঙ্কুর দেখতে পাই। সেখানে তিনি বিভিন্ন ধর্মের বিশেষ শিক্ষা ও অভ্যাসগুলো ত্যাগ করে 'সৃষ্টির আদি কারণ' অনুসন্ধান করেন। সেই একত্ববাদ একটা বিশ্বদৃষ্টিতে পরিণত হয় সাংস্কৃতিক উপনিবেশায়নের মধ্যস্থতায়।

রামমোহন বুঝতে পেরেছিলেন ভারতীয় সমাজ নানা অন্ধবিশ্বাস এবং কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। একইসঙ্গে তারা বিভিন্ন বর্ণ, জাতি ও শ্রেণিতে বিভক্ত। নানা রকম কু-অভ্যাস, ক্ষতিকর প্রথা ও বিশ্বাসের কারণে তারা নিজেরাই নিজেদেরকে নানা নাগরিক ও সামাজিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত করছে। একারণে ধর্মের এসব অভ্যাস থেকে মুক্ত করে তিনি তাদেরকে নিরাকার পরমেশ্বরের উপাসনালয়ে এনে একত্র করতে চেয়েছিলেন। ১৮১৫ সালে অদৃশ্য ও অদ্বৈত ব্রহ্মের উপাসনা করার জন্য তিনি প্রতিষ্ঠা করেন আত্মীয়সভা। ব্রহ্মসভা বা ব্রাহ্ম সমাজ তারই পরিণতি। সেখানে এমন নীতি ধার্য করা হয় যে বর্ণ, জাতি, ধর্ম ও দেশ নির্বিশেষে সবাই উপাসনা করতে পারবে, কিন্তু কোনো সম্প্রদায়বাচক বিশেষ দেবতার নামে পূজা-অর্চনা করা যাবে না। এই সমাজ, অভিজাত শ্রেণির হিন্দুরাই যার উদ্যোক্তা, চেয়েছে ভারতীয় সমাজের এমন একটা রূপান্তর যা ঔপনিবেশিক শাসনের উপযোগী। কাজেই বলা যায়, রামমোহনের দার্শনিক সিদ্ধান্ত ছিল এক প্রকার বুদ্ধিবৃত্তিক নির্বাচন, যা ইউরোকেন্দ্রিক সমাজ চেতনা দিয়ে নিয়ন্ত্রিত। এস. কোলেট রামমোহনের জীবনীগ্রন্থে স্ট্যানফোর্ড আর্নট-এর বক্তব্য উদ্ধৃত করে বলেন, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ধর্মের সামাজিক উপযোগবাদী চিন্তা রামমোহনকে আচ্ছন্ন করেছে এবং সন্দেহবাদকে তিনি ক্ষতিকর হিসেবে দেখেছেন। রামমোহন নিজেও ১৮২৮ সালের ১৮ জানুয়ারি এক ব্যক্তিগত চিঠিতে বলেন, 'হিন্দুদের বর্তমান ধর্মব্যবস্থা তাদের রাজনৈতিক সুবিধা বাড়ানোর পক্ষে উপযোগী নয়। বর্ণ বৈষম্য তাদেরকে নানা বিভাগ, উপবিভাগে বিভক্ত করে রেখেছে, যার কারণে তারা দেশপ্রেমের অনুভূতি থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত। ...আমি মনে করি, তাদের ধর্মের কিছু পরিবর্তন হওয়া জরুরি, অন্তত তাদের রাজনৈতিক সুবিধা ও সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্যের জায়গা থেকে হলেও' (এস ডি কোলেট, ১৯১৪, পৃ. ২১৩)।

উনিশ শতকের গোড়ায় যখন পশ্চিমা সাংস্কৃতিক উপনিবেশায়ন জোরদার হচ্ছে, সে-সময় পশ্চিমা যুক্তিবাদ ও আধুনিকতার ধারণাও শিক্ষিত শ্রেণির মধ্যে সঞ্চারিত করতে থাকে নতুন মূল্যচেতনা। এই শ্রেণির মূল্যবিচারের মাপকাঠি হয়ে ওঠে পশ্চিমা যুক্তিবাদ, যার নিরিখ হলো, যা কিছু পুরাতন তাই পশ্চাদ্‌পদ আর ঐতিহ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নতুনকে গ্রহণ করাটাই আধুনিকতা। এ সময় শিল্প-সাহিত্য, ভাষা, ধর্ম, শিক্ষা, সামাজিকতা– সবকিছুর মূল্যবিচার হতে থাকে পশ্চিমা যুক্তিবাদ ও আধুনিকতা দিয়ে। তরুণদের মধ্যে এসময় পুরাতন প্রথা, উপধর্ম এবং সংস্কার ভাঙার যে জোয়ার সৃষ্টি হয়েছিল তাতে ফরাসি বিপ্লবের প্রভাব ছিল নিঃসন্দেহে। কিন্তু কোনটা ভালো, কোনটা মন্দ, কোনটা শ্রেষ্ঠ এবং কোনটা নয়, কোনটা গ্রহণীয় কোনটা নয়, এই বিচারের ক্ষেত্রে ইউরোকেন্দ্রিকতা ছিল সর্বব্যাপী।

ভারতীয় ঐতিহ্য ও পরম্পরার মধ্যে কেবল শাস্ত্র ছাড়া অন্য সবকিছু থেকে নিজেকে বিযুক্ত করেন রামমোহন। পশ্চিমা সভ্যতার উপাদানগুলোকে গ্রহণ এবং ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে এই বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে পশ্চিমা যুক্তিবাদ হয়ে ওঠে সেই নিরিখ। পশ্চিমা আধুনিকতার অখণ্ডতার ধারণা ও একরৈখিকতা রামমোহনকে এদেশীয় সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের প্রতি মনোযোগী হতে দেয়নি। নিজে অদ্বৈতবাদী এবং বিশ্বজনীন ধর্মের মীমাংসক হলেও এদেশের জনদর্শনে থাকা অদ্বৈতবাদী ধারাগুলোর প্রতি তিনি অবজ্ঞা ও ঔদাসীন্য দেখিয়েছেন। এদেশের বাউল-ফকির, বৈষ্ণব সহজিয়া, বলরামী, সাহেবধনী– এসব সাধনধারা অদ্বৈতবাদী, এবং প্রতিটি সম্প্রদায়ই তাদের ভাব-অনুভব এবং চর্চা নিয়ে একেকটি জীবন্ত ধারা। লালন ফকিরসহ রামমোহনের সমকালীন বাউল-ফকিরেরা জাত, বর্ণ ও লিঙ্গবৈষম্যের বিরুদ্ধে গান গেয়েছেন এবং মানুষের পারমার্থিক মুক্তির পথ খুঁজেছেন। কিন্তু রামমোহন তাদের যুক্তি ও চিন্তাকে পুরোপুরি উপেক্ষা করে গেছেন। বৈষ্ণব সহজিয়াদের সম্পর্কে তিনি বলেন, 'গৌরাঙ্গ যাহার পরব্রহ্ম ও চৈতন্যচরিতামৃত যাহার শব্দব্রহ্ম তাঁহার সহিত শাস্ত্রীয় আলাপ যদ্যপিও কেবল বৃথা শ্রমের কারণ হয়, তথাপি কেবল অনুকম্পাধীন এ পর্যন্ত চেষ্টা করা যাইতেছে' (রামমোহন, ১৯৭৩, পৃ. ৩০০)। *পথ্য প্রদান* বইয়ে রামমোহন সহজিয়া বৈষ্ণবদের নিয়ে যে আলোচনাটুকু করেন সেটা কেবলই অনুকম্পাবশত।

ব্রাহ্ম সমাজের ট্রাস্ট ডিডে ঘোষণা ছিল, সমাজের উপাসনাঘরে সব জাতি ও বর্ণের মানুষ কেবল নিরাকার পরমেশ্বরের উপাসনা করবে, কোনো সম্প্রদায়সূচক দেবতার নাম নেবে না। অর্থাৎ পরিভাষা ও প্রতীকচিহ্নগুলোই হয়ে উঠেছে বড় বাধা, যেন ওই সব পরিভাষা-প্রতীকগুলোকে বিদায় করা গেলেই সমাজভেদ ও বর্ণভেদের বাস্তব পরিপ্রেক্ষিতগুলো দূর হয়ে যাবে। অন্যদিকে, আমরা দেখি এদেশের বাউল-ফকিরেরা সেইসব ব্যবস্থা ও বিধি-

বিধানগুলোকে দূরাচার বলে অস্বীকার করে গেছেন যা মানুষে মানুষে ভেদ সৃষ্টি করে। তাদের কাছে সাধনচর্চার মর্মবস্তুটাই আসল কথা; সেই নিগূঢ়তত্ত্ব, পরমভাব যাকে তারা দেহের বাস্তবতায় উপলব্ধি করতে চেয়েছেন, চেয়েছেন প্রাকৃত মানুষ থেকে অপ্রাকৃত মানুষ হয়ে উঠতে। সেই পরম ভাবকে কোন নামে ডাকা হলো সেটা বড় কথা নয় এবং কোন পরিভাষায় সাধন পদ্ধতি প্রকাশ করা হলো তাতেও কিছু যায় আসে না। একারণে তারা পুরুষ-প্রকৃতি, রাধা-কৃষ্ণ, আল্লাহ, নবি, মোকাম-মঞ্জিল, লা শরিক ইত্যাদি অর্থপূর্ণ সকল পরিভাষা গ্রহণ করেছেন নির্দ্বিধায়, এসবে দিয়েছেন নতুন তাৎপর্য এবং ভাব প্রকাশের এক সঞ্চরণশীল উন্মুক্ত ক্রীড়াকে যুক্ত করেছেন তাদের ভাবচর্চায়। এই বাউল-ফকিরেরা বৈদিক ও ব্রাহ্মণসমাজের অন্যায্য বিধিবিধানের বিরুদ্ধেও তাদের উপলব্ধি প্রকাশ করে গেছেন গানে গানে। ফকির লালন সাঁই গেয়েছেন: পাবে সামান্যে কি তার দেখা বেদে নাই যার রূপরেখা, অর্থাৎ বাউল-ফকিরেরা যে পরমভাবের সন্ধান করে, তার রূপরেখা বৈদিক সামান্য ধারণা দিয়ে প্রকাশ করা অসম্ভব।

রামমোহন গোঁড়া ধার্মিক ছিলেন না কখনোই। কোনো ধর্মের অযৌক্তিক বিশ্বাস এবং আচার-অনুষ্ঠান নির্বিচারে গ্রহণ করবেন তাঁর ক্ষেত্রে এটা অকল্পনীয়। কিন্তু সাংস্কৃতিক উপনিবেশায়নের যুগে খ্রিষ্টধর্ম এবং যীশুর উপদেশ তাঁকে প্রভাবিত করে। তিনি *দ্য প্রিসেপ্টস অব যেশাস: দ্য গাইড টু পিচ অ্যান্ড হাপিনেস* নামে একটা বই লেখেন। এতে যীশুর সেইসব বাণী ও উপদেশ তিনি গ্রহণ করেন যা মানব সমাজের সুখ ও সম্প্রীতির জন্য সহায়ক। অন্যদিকে, যীশুর দেবত্ব, ত্রিত্ববাদ, অলৌকিকত্ব, পবিত্রাত্মার আগমন– খ্রিষ্টধর্মের এইসব ধারণা তিনি পরিত্যাগ করেন।

কলকাতার ইউনিটারিয়ান মিশনের প্রতিষ্ঠাতা উইলিয়াম অ্যাডাম ছিলেন রামমোহনের ঘনিষ্ট বন্ধু। রামমোহন ইউনিটারিয়ান চার্চে যাতায়াত করতেন এবং প্রার্থনায় অংশ নিতেন। অ্যাডামের ধারণা ছিল তিনি রামমোহনকে খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত করতে পেরেছেন এবং ভারতবর্ষে রামমোহনই হবেন খ্রিষ্টধর্মের সবচেয়ে বড় প্রচারক। কিন্তু অ্যাডাম নিজেই রামমোহনের প্রভাবে ত্রিত্ববাদের ধারণা পরিত্যাগ করেন এবং এ নিয়ে শ্রীরামপুর মিশনারিদের সঙ্গে তাঁর ছাড়াছাড়ি হয়। রামমোহন নিজেও তাঁদের কোপানলে পড়েন এবং মিশনারিদের প্রেসে তাঁর বই প্রকাশ বন্ধ হয়।

রামমোহন কোনো ঘন ঘন ইউনিটারিয়ান চার্চে যান এ নিয়ে এক হিন্দুর প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, সেখানে যে প্রার্থনা ও উপাসনা হয় এবং যে ধর্মোপদেশ দেওয়া হয় সেসব তাঁকে

অনন্ত জগতের একজন চালকের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। সেখানে মানব বা প্রকৃতিরূপী ঈশ্বর, অবতারবাদ, ত্রিত্ববাদ ইত্যাদি ধারণা নেই (রামমোহন, ১৯০৬, পৃ. ২০২)। রামমোহন অনতিকাল পরে অনেকটা ইউনিটারিয়ান সমাজের আদলেই 'ব্রাহ্ম সমাজ' নামে এক সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন।

রামমোহনের ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা নিয়ে একটা ঘটনার কথা উল্লেখ করেন শিবনাথ শাস্ত্রী। তিনি লিখেছেন, রামমোহন একদিন ইউনিটারিয়ান চার্চ থেকে বাড়ি ফিরছেন। গাড়িতে ছিলেন তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী ও চন্দ্রশেখর দেব। পথে চন্দ্রশেখর দেব বলেন, 'দেওয়ানজী, বিদেশিয়দের উপাসনাতে আমরা যাতায়াত করি, আমাদের নিজের একটা উপাসনার ব্যবস্থা করিলে হয় না?' (শিবনাথ শাস্ত্রী, ১৯০৯, পৃ. ৯৮)। রামমোহন চন্দ্রশেখরের প্রস্তাব আমলে নেন এবং কালীনাথ মুন্সী, দ্বারকানাথ ঠাকুর, মথুরানাথ মল্লিকসহ তাঁর আত্মীয়সভার বন্ধুদের সঙ্গে পরামর্শ করে ব্রহ্ম উপাসনার জন্য একটি ঘর ভাড়া করেন। পরে ১৮৩০ সালে ব্রাহ্ম সমাজের নতুন উপাসনালয় বানানো হয়। বিনয় ঘোষ বলেন, 'ব্রাহ্ম সমাজের উপাসনাগৃহের ভিতরের স্থাপত্য থেকে আরম্ভ করে সাপ্তাহিক উপাসনা, উপাসনা পদ্ধতি প্রভৃতি সবকিছুর উপর খ্রিষ্টান গির্জা ও ধর্মের প্রভাব ছিল প্রত্যক্ষ (বিনয়, ১৩৫৫, পৃ. ১৫৪)।

খ্রিষ্টের উপদেশ ও নৈতিক আদর্শ রামমোহনকে অনুপ্রাণিত করেছে, কিন্তু মিশনারিদের দ্বারা এদেশের হিন্দু ও মুসলমানদের ধর্মান্তরকে তিনি মানতে পারেননি। তিনি বলেন, কোনো শাসক জাতির পক্ষে তাদের ধর্মকে শাসিতদের উপর চাপিয়ে দেওয়া সঙ্গত নয়। ক্ষমতার দ্বারা অধিকৃত, ভীত ও দুর্বলদেরকে লোভ দেখিয়ে ধর্মান্তরিত করা ধর্মের উপর দৌরাত্ম্য (রামমোহন ১৯৭৩, পৃ. ২৩৩-২৩৪)। মিশনারিদের বিরুদ্ধে এই প্রতিবাদের মধ্যে ব্যক্তির স্বাধীনতা সম্পর্কিত রামমোহনের এক স্বচ্ছ উপলব্ধি টের পাওয়া যায়। সিভিল ও রিলিজিয়াস লিবার্টির এরকম অনেক উপাদান আছে ইংল্যান্ডের রাজা চতুর্থ জর্জকে লেখা রামমোহনের চিঠিতে। জেরমে বেন্থাম এই পত্রকে মিলটনের *অ্যারিওপ্যাজিটিকা*-এর সঙ্গে তুলনা করেন (প্রমথ, ১৯৬৮, পৃ. ১৬৬)। রামমোহনের এই উপলব্ধি ছিলো যে, রাজনৈতিক স্বাধীনতার প্রয়োজনে ব্যক্তিকে আগে নিজের অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার এবং কুপ্রথা ও অভ্যাস থেকে মুক্ত হতে হবে। এই স্বাধীনতাই তাঁর মধ্যে রাজনৈতিক স্বাধীনতার বোধ সৃষ্টি করবে। এজন্য তিনি ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান ও আলোকায়নকে গ্রাহ্য করেন এবং তাদের সাংস্কৃতিক উপনিবেশায়নকে মেনে নেন। তিনি এমনকি ব্রিটিশ শাসকদের শোষণ-নিপীড়ন এবং নির্মম স্বার্থপরতাকেও উপেক্ষা করে গেছেন, এই ভাবনা থেকে যে এদেশের বেশির ভাগ মানুষ

সংস্কারমুক্ত হয়ে একসময় নিজেদের রাজনৈতিক অধিকার এবং সামাজিক সুবিধা ও স্বাচ্ছন্দ্য আদায় করে নিতে পারবে। রামমোহনের এই ভাবনাতেও ব্রিটিশ উপযোগবাদের স্পষ্ট প্রভাব লক্ষ করা যায়।

রামমোহনের দর্শন থেকে আমরা পাই এক উদারগণতান্ত্রিক মানবের ধারণা। সেই মানব পশ্চিমা জ্ঞান-বিজ্ঞান, আধুনিকতা ও তার যুক্তিবাদের আলোয় উজ্জ্বল এবং সে বাস করে এক অখণ্ড মানব সমাজে, যে সমাজের মানুষের প্রতি সে অনুভব করে প্রীতি ও ভালোবাসা। রামমোহনের এই মানব অসীম ব্রহ্মাণ্ডের অংশ। সে নশ্বর, কিন্তু তাকে ছুঁয়ে আছে, তার ভেতর দিয়ে মূর্ত হয়ে আছে অদ্বৈত, অনির্বচনীয় ও অসীম ব্রহ্ম।

সহায়কপঞ্জি

অক্ষয়কুমার দত্ত। (২০১৪)। *শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ* [সম্পা. মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম], কথাপ্রকাশ, ঢাকা।

কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য। (১৯৯২)। 'মননে স্বরাজ'। *ইউরোকেন্দ্রিকতা ও শিল্প সংস্কৃতি* [সম্পা. অঞ্জন সেন], গাঙ্গেয় পত্র, কলকাতা।

দিলীপ কুমার বিশ্বাস। (১৯৯৯)। 'রামমোহন রায় ও বেদান্ত'। *বাংলাদেশে দর্শন: ঐতিহ্য ও প্রকৃতি অনুসন্ধান*, দ্বিতীয় খণ্ড [সম্পা. শরীফ হারুন], বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

দেবোত্তম চক্রবর্তী। (২০২২)। *রামমোহন ও তাঁর সময়: ভিন্ন চোখে*। গ্রন্থিক প্রকাশন, ঢাকা।

প্রমথ চৌধুরী। (১৯৬৮)। *প্রবন্ধসংগ্রহ*। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা।

বিনয় ঘোষ। (১৩৫৫ বাং)। *বাংলার নবজাগৃতি*। ওরিয়েন্ট লংম্যান লিমিটেড, কলকাতা।

রণজিৎ গুহ। (২০১০)। *দয়া: রামমোহন রায় ও আমাদের আধুনিকতা*। তালপাতা, কলকাতা।

রাখালচন্দ্র নাথ। (১৯৯৯)। 'রামমোহন সম্বন্ধে ঐতিহাসিক সত্যাসত্যের সন্ধানে'। *বাংলাদেশে দর্শন: ঐতিহ্য ও প্রকৃতি অনুসন্ধান*, তৃতীয় খণ্ড [সম্পা. শরীফ হারুন], বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

রোমাঁ রোলাঁ। (১৯৫৬)। *রামকৃষ্ণের জীবন*। ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলকাতা।

শিবনাথ শাস্ত্রী। (১৯০৯)। *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ*। এস. কে. লাহিড়ী এন্ড কোং, কলকাতা।

শিশিরকুমার দাশ। (১৯৯৯)। 'রামমোহন ও খ্রিস্টধর্ম'। *বাংলাদেশে দর্শন: ঐতিহ্য ও প্রকৃতি অনুসন্ধান*, তৃতীয় খণ্ড [সম্পা. শরীফ হারুন], বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

রামমোহন রায়। (১৯৭৩)। *রামমোহন রচনাবলী* [সম্পা. অজিতকুমার ঘোষ], হরফ প্রকাশনী, কলকাতা।

Benoy Gopal Ray. (1947). *Contemporary Indian philosophy*. Kitabistan, Allahabad, India.

Rammohun Roy. (1906). *The english works of Raja Rammohun Roy*. The Panini office, Allahabad, India.

Collet, S D. (1914). *The life and letters of Raja Rammohun Roy* [ed. Hem Chandra Sarkar], Calcutta.

Sumit Sarkar. (2000). *A critique of colonial India*. Papirus, Calcutta.

William Adam. (1879). *A lecture on the life and labours of Rammohun Roy* [ed. by Rakhal Das Haldar], G. P. Roy & Co., Calcutta.